মহাকাশ কী?

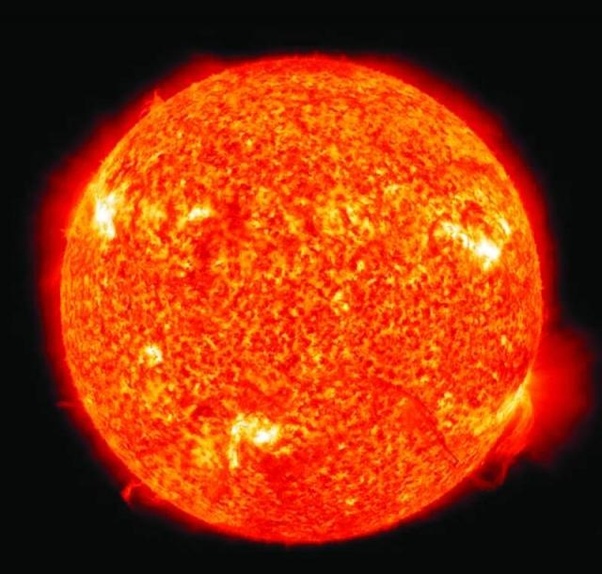
.

.

মহাকাশ আমাদের সব সময় টানে। কত রহস্য লুকিয়ে আছে এখানে। কোথা থেকে কীভাবে এর উদ্ভব? রাতের আকাশে কীভাবে উল্কাবৃষ্টি হয়, কেন হ্যালির ধূমকেতু প্রতি ৭৬ বছর পর একবার করে সূর্যকে ঘুরে যায়। সুপারনোভার মধ্যে লুকিয়ে আছে কত অজানা রহস্য। এসব জানার আগ্রহ আমাদের সবার।

পৃথিবী থেকে ৫০ আলোকবর্ষ দূরের কোনো গ্রহে আমাদের চেয়েও বুদ্ধিমান কোনো সমাজের সদস্যরা হয়তো এই মুহূর্তে বিশেষ ধরনের অ্যান্টেনা লাগিয়ে সুচিত্রা-উত্তমের *হারানো সুর*ছবিতে ‘তুমি যে আমার...’ গানটি শুনছে! ভাবতে অবাক লাগে, কিন্তু এটা সম্ভব। কারণ, ১৯৬৪ সালে রূপমহল সিনেমা হলে ঠিক যে গানের দৃশ্যটি রোমাঞ্চিত করেছিল, তা আলোকতরঙ্গরূপে মহাকাশে অবিরাম চলতে চলতে ৫০ বছরে সেখানে পৌঁছেছে।

এক আলোকবর্ষ কত দূর? আলোকতরঙ্গ কোনো শূন্য মাধ্যমে এক বছরে যত দূর যায়, সেটাই এক আলোকবর্ষ দূরত্ব। আলো প্রতি সেকেন্ডে যায় প্রায় তিন লাখ কিলোমিটার। অর্থাৎ এক সেকেন্ডে আলো বিষুবরেখা বরাবর পৃথিবীকে সাড়ে সাতবার চক্কর দিয়ে আসতে পারে। এই গতিতে আলো এক বছরে সাড়ে নয় ট্রিলিয়ন কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। ৯৫-এর পর ১১টি শূন্য বসালে এই সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। এটাই এক আলোকবর্ষ। এই বিশাল দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা করার জন্য আমরা সূর্যের দূরত্বের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে পারি। পৃথিবী থেকে সূর্য প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে। সূর্যের আলো আসতে লাগে প্রায় আট মিনিট। মহাজাগতিক এককে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব মাত্র আট আলোক মিনিট। এর ৩২ হাজার গুণ দূরত্বকে আমরা বলতে পারি এক আলোকবর্ষ। এ রকম প্রায় চার আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে সূর্যের পর আমাদের সবচেয়ে কাছের তারা প্রক্সিমা সেনটওরি। গ্রহ-তারা-নীহারিকাগুলো এত দূরে দূরে যে আলোকবর্ষ দিয়ে মহাজাগতিক দূরত্ব প্রকাশ করতে হয়।

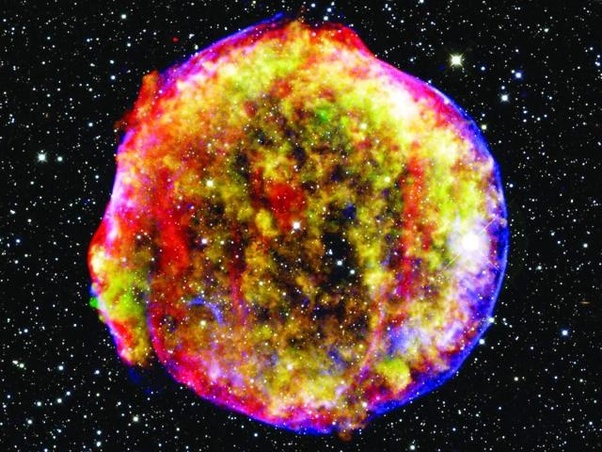


সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌছাতে লাগে প্রায় আট মিনিট…

মহাকাশবিজ্ঞানীরা বলেন, প্রায় পৌনে চৌদ্দ শ কোটি বছর আগে ‘বিগ ব্যাং’ বা মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে আমাদের এই মহাবিশ্বের সূচনা ঘটেছিল। এর পর থেকে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। বিগ ব্যাং নিয়ে রয়েছে আমাদের অনেক প্রশ্ন। এই মহাবিস্ফোরণ কি মহাশূন্যেই ঘটেছিল? আমরা যখন বলি মহাশূন্য সম্প্রসারিত হচ্ছে, সেটা কোথায় হচ্ছে? তার মানে, মহাশূন্যের বাইরে আরও কিছু শূন্য জায়গা আছে নাকি? না হলে সম্প্রসারিত হবে কোথায়? বিগ ব্যাংয়ের শুরুতে কী ছিল তা জানার জন্য মহাজাগতিক বিকাশপ্রক্রিয়া রি-ওয়াইন্ড করে পৌনে চৌদ্দ শ কোটি বছর আগে ফিরে গেলে আমরা একটি বিন্দুতে পৌঁছাব। দেখা যাবে সেখানে মহাশূন্য বলে কিছু নেই। যেমন, একটি বেলুন ফোলানোর আগে তার গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে কালির কয়েকটি ফোঁটা দিলে একটি বিন্দুর মতো দেখাবে। এবার বেলুনটি ফোলাতে শুরু করলে সেই বিন্দুগুলো ক্রমে বড় ও একে অপরের থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে। মহাশূন্যে নীহারিকা, ছায়াপথ, তারা প্রভৃতির সৃষ্টি ও বিকাশ এভাবেই ঘটে চলেছে বলে বিজ্ঞানীরা বলছেন।

এসব জটিল প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। ২০১১ সালে পদার্থবিজ্ঞানে পুরস্কারপ্রাপ্ত সল পার্লমুটার, ব্রায়ান স্মিড ও অ্যাডাম রিয়েস সুপারনোভা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাঁরা লক্ষ করলেন, দূরে বিস্ফোরিত কোনো সুপারনোভা থেকে আলোর ঝলক আসতে আগের হিসাব অনুযায়ী যত সময় লাগার কথা, এখন তার চেয়ে বেশি সময় লাগছে আর আলোও অনেকটা হালকা হয়ে আসছে। এ থেকেই তাঁরা বললেন, মহাবিশ্ব শুধু সম্প্রসারিতই হচ্ছে না, এই সম্প্রসারণ ঘটছে ত্বরণ গতিতে।

মহাবিশ্বের কোথাও বিশাল আকারের তারার প্রচণ্ড বিস্ফোরণকে বলে সুপারনোভা। এর ফলে এমনকি এক হাজারটি সূর্যের সমান আলোর বিকিরণ হতে পারে। এই সুপারনোভা নিয়ে গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা মহাকাশের অনেক রহস্যের সমাধান বের করছেন।



সুপারনোভা

এই মহাশূন্যে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন তারা, আবার অন্যদিকে কিছু তারার মৃত্যুও ঘটছে। মহাশূন্যের কোথাও সঞ্চিত মহাজাগতিক বস্ত্তকণা ও গ্যাসের মেঘ থেকে তারার জন্ম। প্রথমে এই মেঘমালা তার ভেতরের বস্ত্তকণার মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে সংকুচিত হতে থাকে। এতে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হয়। কয়েক কোটি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটতে থাকে। এর ফলে একটি অণু থেকে অন্য অণু জন্ম নেয়। এই প্রক্রিয়ায় শক্তি বেরোয়। এ সময় একদিকে শক্তির প্রভাবে মহাজাগতিক মেঘের প্রসারণ ঘটে ও অন্যদিকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে টেনে একটি সীমার মধ্যে রাখতে চায়। একসময় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাই তারা। তারার ভেতর হাইড্রোজেন অণু পুড়ে হিলিয়ামে পরিণত হয়। একসময় সব জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে তারার মৃত্যু ঘটে। মহাকাশ এক মহাবিস্ময়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গবেষণায় অনেক নতুন তথ্য বেরিয়ে আসছে। এসব জানা খুব দরকার। কারণ আমরা তো নিজেদের একটু এগিয়ে রাখতে চাই।

**মহাকাশ** বলতে সাধারণভাবে মাথার উপরকার অনন্ত আকাশ বোঝানো হলেও বস্তুত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলসমৃদ্ধ আকাশকে পৃথিবীর আকাশ বলা হয়। তাই পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে মহাকাশ হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরের অনন্ত স্থান। এ আকাশসীমায় অতি অল্প ঘনত্বের বস্তু বিদ্যমান। অর্থাৎ শূন্য মহাশূন্য পুরোপুরি ফাঁকা নয়। প্রধানত, অতি অল্প পরিমাণ হাইড্রোজেন প্লাজমা, তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ, চৌম্বক ক্ষেত্র এবং নিউট্রিনো এই শূন্যে অবস্থান করে। তাত্ত্বিকভাবে, এতে কৃষ্ণবস্তু এবং কৃষ্ণশক্তি বিদ্যমান।মহাশূন্য এমন অনেক কিছু আছে যা মানুষ এখনও কল্পনা করতে পারেনি।

রকেটের পূর্বে সর্বোচ্চ পরিচিতির অভিমুখে ছিল ১৯৪০ দশকের [পারিস বন্দুকের](https://bn.wikipedia.org/w/index.php?action=edit&redlink=1&title=%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B8_%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0) গুলি, যেটা এক প্রকার জার্মান দূরগামী [সিয়েজ ইঞ্জিন](https://bn.wikipedia.org/w/index.php?action=edit&redlink=1&title=%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%9C_%E0%A6%87%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A8) এবং এটি [প্রথম বিশ্বযুদ্ধের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A5%E0%A6%AE_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7) সময় অন্তত ৪০ কিমি. উচ্চতায়ে পৌঁছেছিল। জার্মান বিজ্ঞানিরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভি-২ রকেট পরীক্ষার মাধমে কৃত্রিম বস্তুকে মহকাশে পাঠানোর জন্য প্দক্ষেপ প্রথমবারের মতো গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে ১৯৪২ সালের ৩ অক্টোবর [এ-৪](https://bn.wikipedia.org/w/index.php?action=edit&redlink=1&title=%E0%A6%8F-%E0%A7%AA) কে মহাকাশে পাঠাইয়। এর মাধ্যমে [এ-৪](https://bn.wikipedia.org/w/index.php?action=edit&redlink=1&title=%E0%A6%8F-%E0%A7%AA)মহাকাশে মানুষের তৈরি প্রথম বস্তুতে পরিণত হয়। যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র জার্মান বিজ্ঞানীদের এবং তাদের আধৃত রকেট সামরিক এবং বেসামরিক প্রোগ্রামে গবেষণায় ব্যবহার করেন। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৬ সালে ভি-২ রকেট দ্বারা মহাজাগতিক বিকিরণ পরিক্ষার মাধ্যমে মহাকাশে প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে। একই বছর পরবর্তীতে আমেরিকানরা ভি-২ রকেট ব্যবহার করে মহাকাশ থেকে প্রথমবার পৃথিবীর ছবি তোলা হয়। ১৯৪৭ সালে মহাকাশে কিছু মাছির মাধ্যমে প্রথম প্রাণী পরীক্ষা করা হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু করে সোভিয়েত ও জার্মান দলের সাহায্যে উপ-কাক্ষিক ভি-২ রকেট ও তার নিজেস বৈকল্পিক [আর-১](https://bn.wikipedia.org/w/index.php?action=edit&redlink=1&title=%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A7%A7) রকেট পাঠায় যেটার কিছু ফ্লাইটে বিকিরণ ও প্রাণী গবেষণা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সকল উপ-কাক্ষিক পরিক্ষা-নিরিক্ষা মহাকাশে খুব অল্প সময় অনুমদন করায় এদের কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

বায়ূমন্ডলের স্তরগুলো এক নজরে দেখে নেয়া যাক।



মহাশূন্য সুপ্রাচীনকাল থেকে মানুষের কৌতূহলের বিষয়। প্রত্যেক সভ্যতা ও মানুষ সবসময় মহাকাশকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে দেখেছে। প্রাচীন সভ্যতা সমূহ ও মানুষেরা মহাশূন্যের ব্যাপারে নানা কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিত। যথাঃ হাতির উপর উল্টানো থালা, বিশাল চাদর, পবিত্র আত্মা ও দেবতাদের বাসস্থান ইত্যাদি। প্রাচীন গ্রিক, রোমান, মিশরীও, বেবিলনীয়, ভারতীয়, চীনা, মায়া ইত্যাদি সভ্যতা মহাশূন্যকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। কিন্তু সকল সভ্যতাই মহাকাশকে বিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে কম-বেশি গ্রহন করেছিলো।

**প্রাচীনকালের মহাকাশ আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণ:**

প্রাচীন গ্রিক ও রোমানরা প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভুমিকা পালন করেছে। প্রাচীন গ্রীসে মহাকাশ কে দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তারা [ন](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0)ক্ষত্র সমূহকে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করে নানা রুপ দিয়েছিল এবং এগুলোর অধিকাংশের নাম গ্রিক ও রোমান দেবতাদের নামে রাখা হয়। যা এখনও বিজ্ঞানী ও মহাকাশ পর্যবেক্ষণকারীদের নানা ভাবে সাহায্য করছে। চাঁদ এবং খালি চোখে দৃশ্যমান গ্রহগুলোর গতিপথও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন গ্রিক ও অন্যান্য সভ্যতা সমূহ এর মাধ্যমে রাশিচক্র আবিষ্কার করে। নক্ষত্র, চাঁদ, ধুমকেতু ইত্যাদি প্রাচীনকাল থেকে পর্যবেক্ষণ করে আসছে মানুষ। ঋতুর পরিবর্তন, দিন-রাত, নক্ষত্রের স্থান পরিবর্তন (পরবর্তীতে যা গ্রহ প্রমাণিত হয়) ইত্যাদির হিসাব ও গাণিতিক ব্যাখ্যার সাহায্যে সুপ্রাচীনকাল ও প্রাচীনকালে অনেক সমৃদ্ধি লাভ করে।

**মধ্যযুগের মহাকাশ আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণ:**

মধ্যযুগে দূরবীক্ষণ যন্ত্রর আবিষ্কারের ফলে এর ব্যাপক প্রসার ঘটে। হান্স লিপারশে (Hans Lippershey) এবং জাকারিয়াস জেন্সেন (Zacharias Janssen) এর নির্মিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র আরও উন্নত করে তুলেন গ্যালিলিও গ্যালিলি। গ্যালিলি তার দুরবিনের মাধ্যমে বৃহস্পতি গ্রহর উপগ্রহ এবং শনি গ্রহর বলয় পর্যবেক্ষণ করতেপেরেছিলেন। ১৬১১ সালে ইয়োহানেস কেপলার একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন যা দ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞানএনতুন যুগের সূচনা হয়। এ সময় বুধগ্রহ, শুক্রগ্রহ, মঙ্গলগ্রহ, বৃহস্পতিগ্রহ, শনিগ্রহ সহ অগণিত নক্ষত্র ও ধূমকেতুপর্যবেক্ষণ এবং আবিষ্কার করা হয়। মধ্যযুগের শেষ পর্যায় ইউরেনাস গ্রহ, নেপচুন গ্রহ, প্লুটো গ্রহ আরও অনেক নক্ষত্র ও ধূমকেতু আবিষ্কার, পর্যবেক্ষণ ও অনুসরণ করা হয়। মধ্যযুগের শেষ পর্যায় পদার্থ, রাসায়ন ও গণিত ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হয় জ্যোতিষশাস্ত্রে। মহাজাগতিক বস্তুর গঠন, আকার-আকৃতি, বায়ু মণ্ডল (গ্যাসীয় পদার্থ সমূহ), কক্ষ পথ, আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি ইত্যাদি নির্ণয়র জন্য এসব শাস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার শুরুহয়। এর আগে শুধু গনিতশাস্ত্র ব্যবহার হত।

**আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান (মহাকাশ আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণ):**

১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুলাই জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ আবিষ্কারের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ অভিযান, প্রথম মনুষ্যবাহী মহাকাশযান অ্যাপোলো ১১, যা ২০ জুলাই চাঁদে অবতরণ করে। এই অভিযানে অংশনেন দলপ্রধান নীল আর্মস্ট্রং, চালক মাইকেল কলিন্স, এডুইন অল্ড্রিন জুনিয়র এবং কমান্ড মডিউল। পরবর্তীতে আবিষ্কার হয়েছে প্লুটো সহ অন্যান্য বামন গ্রহ, নেহারিকা, ধূমকেতু, কৃষ্ণগহ্বর।বিজ্ঞান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে শক্তিশালী কৃত্রিম উপগ্রহ, দূরবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি। যথাঃ হাবল টেলিস্কোপ। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান মহাবিশ্বকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীর কারনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তাদের মদ্ধে, আন্নি জাম কেনন (Annie Jump Cannon), মারিয়া মিশেল (Maria Mitchell), সি.ডব্লীউ থমবারগ(C.W. Tombaugh) হানরিটা সোয়ান লেভিট (Henrietta Swan Leavitt) প্রমুখ।

**প্রথম মানব উড্ডয়ন:**

প্রথম সফল মানব মহাকাশযাত্রা হয় ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিলে। ভস্টক ১ (পূর্ব ১) ২৭ বছর বয়স্ক রাশিয়ান মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিনকে মহাকাশে নিয়ে যায়। এই মহাকাশযানটি প্রায় ১ ঘন্টা এবং ৪৮ মিনিট ধরে পৃথিবীর চারদিকে একবার আবর্তন করে। ভস্টক ১ এর এক মাসের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবার অ্যালান শেপার্ডকেমারকিউরি-রেডস্টোনের উপকাক্ষিক যাত্রায় মহাকাশে পাঠায়। ১৯৬২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারীতে জন গ্লেন **মারকিউরি-অ্যাটলাস ৬**এ পৃথিবীকে আবর্তনের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাক্ষিক যাত্রা অর্জন করে। ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা, প্রথম নারী হিসেবে ১৯৬৩ সালের ১৬ই জুনে ভস্টক ৬-এ করে পৃথিবীকে ৪৮ বার আবর্তন করেন। ভস্টক ১ পাঠানোর ৪২ বছর পরে ২০০৩ সালের ১৫ই অক্টোবরে ইয়াং লিওয়েই এর শনযউ ৫ (মহাকাশের নৌকা ৫) মহাকাশযানের যাত্রার মাধ্যমে চীন প্রথমবার মহাকাশে মানুষ পাঠায়।

**প্রথম গ্রহসংক্রান্ত গবেষণা:**

১৯৫৭ সালের লুনা ২ হল প্রথম কৃত্রিম বস্তু যা অন্য নভঃস্থিত গঠনে পাঠানো হয়। অন্য নভঃস্থিত গঠনের উপর প্রথম স্বয়ংক্রিয় অবতরন ঘটে ১৯৬৬ সালে লুনা ৯ এর মাধ্যমে দ্বারা সঞ্চালিত হয়। লুনা ১০ চাঁদের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। ১৯৬৯ সালের ২০ই জুলাই মাসে অ্যাপোলো ১১ দ্বারা অন্য নভঃস্থিত গঠনে প্রথমবার মনুষ্যবাহী অবতরন ঘটে। প্রথম সফল আন্তঃগ্র্রহীয় মিশন ছিল মারিনার ২ এর শুক্র গ্রহের কাছে যাওয়া (প্রায় ৩৪,০০০ কিমি.)। অন্য গ্রহগুলোর মধ্যে মঙ্গলে ১৯৬৫ সালে মারিনার ৪ দ্বারা প্রথমবার উড়া হয়েছে, ১৯৭৩ সালে বৃহস্পতি গ্রহে মারিনের পায়োনীয়ার ১০ দ্বারা, ১৯৭৪ সালে বুধগ্রহে মারিনার ১০ দ্বারা, ১৯৭৯ সালে শনিগ্রহে পায়োনীয়ার ১১ দ্বারা, ১৯৮৬ সালে ইউরেনাসের জন্য ভয়েজার ২ দ্বারা, ১৯৮৯ সালে নেপচুনে ভয়েজার ২ দ্বারা। ২০১৫ সালে বামন গ্রহ সিরিসএবং প্লুটো যথাক্রমে **ডন** এবং **নিউ হরাইজন্স** অতিক্রম করে। প্রথম আন্তঃগ্র্রহীয় মিশন (খুব কাছাকাছি গিয়ে অন্য গ্রহে তথ্য প্রেরন করে এবং যার মধ্যে ১৯৭০ সালের (ভেনেরা ৭ ছিল) ২৩ মিনিটের জন্য পৃথিবীকে তথ্য ফেরত দেয়। ১৯৭৫ সালে ভেনেরা ৯ প্রথমবার অন্য গ্রহের পৃষ্ঠ থেকে ছবি পাঠায়। ১৯৭১ সালে [মারস ৩](https://bn.wikipedia.org/w/index.php?action=edit&redlink=1&title=%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B8_%E0%A7%A9) মিশন সবপ্রথম ভালভাবে অবতরণ করার মাধ্যমে ২০ সেকেন্ডের জন্য তথ্য দেয়। পরবর্তীতে এই ব্যাপ্তিকাল বৃদ্ধি পাওয়ার দক্ষতা অর্জন করে যার মধ্যে [ভাইকিং ১](https://bn.wikipedia.org/w/index.php?action=edit&redlink=1&title=%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%82_%E0%A7%A7) মঙ্গলের পৃষ্ঠে ১৯৭৫-১৯৮২ সাল পর্যন্ত ৬ বছরের বেশি গবেষণা করে এবং [ভেনেরা-১৩](https://bn.wikipedia.org/w/index.php?action=edit&redlink=1&title=%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A7%A7%E0%A7%A9) দ্বারা ১৯৮২ সালে বুধের উপরিভাগ থেকে যোগাযোগ স্থাপন করে যা সোভিয়েতের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠের মিশন ছিল।

**মহাকাশের উপাদানসমূহ:**

প্রাথমিক বিবেচনায় মহাকাশূন্যে পদার্থ এবং প্রতিপদার্থ রয়েছে। তবে বিশদ বিবেচনায় মহাকাশূন্যের উপাদানসমূহ হলো:

* তেজস্ক্রীয় পদার্থ (যেমন: তারকা বা তারা বা সূর্য, ধূমকেতু)
* অতেজষ্ক্রীয় পদার্থ (যেমন: গ্রহ, উপগ্রহ, বামন গ্রহ, উল্কা)
* গ্যাসীয় পদার্থ (যেমন: হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, নাইট্রোজেন, সালফার ইত্যাদি)
* প্রতিপদার্থ (যেমন: এন্টিপ্রোটন, এন্টিইলেক্ট্রন)

1. [মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ভেসে আসছে অজানা সংকেত! | কালের কণ্ঠ](https://www.kalerkantho.com/online/miscellaneous/2017/07/18/520731)
2. [( মহাকাশ এর কিছু তথ্য ) - কালের সময় এর বাংলা ব্লগ । bangla blog | সামহোয়্যার ইন ব্লগ - বাঁধ ভাঙ্গার আওয়াজ](https://www.somewhereinblog.net/blog/JUWEL777/30019877)
3. [মহাকাশ সম্পর্কে ১০টি অবাক করা তথ্য যা আপনি জানেন না](https://ebela.in/technology/10-things-you-do-not-know-about-space-dgtl-1.396317)
4. [মহাকাশ অনুসন্ধান](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6_%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8)